গুলশান হামলাঃ একটি পর্যালোচনা

উস্তাদ আবু আনওয়ার আল হিন্দি হাফিজাহুল্লাহ

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

ইন্নাল হামদালিল্লাহ ওয়াস সলাতু ওয়াস সালামু 'আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া 'আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লাম তাসলিমান কাসিরা।

'আম্মা বা'আদ...

১/৭/২০১৬ তে ঢাকার গুলশানে হলি আর্টিযান বেকারিতে সংঘটিত হামলায় নিহত হয় ২০ বিদেশী নাগরিক, দুই মুরতাদ পুলিশ অফিসার যার মধ্যে একজন কুখ্যাত সালাউদ্দীন, ৫ আক্রমণকারী ও হলি আর্টিযানের একজন কর্মচারী।

জামাতুল বাগদাদী ("আইএস") তাদের সংবাদ সংস্থা "আমাক্ব" – এর মাধ্যমে আক্রমণ চলাকালীন অবস্থাতেই হামলার দায় স্বীকার করে।

বেশ কিছু কারণে গুলশান হামলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের ইতিহাসে এটি সর্বপ্রথম "সন্ত্রাসী" হামলা যেখানে বন্দী অবস্থার (Hostage Situation) উদ্ভব হয়েছে। একই সাথে এটি বাংলাদেশের সর্বপ্রথম হামলা যেখানে ব্যাপক ভাবে বিদেশী নাগরিক নিহত হয়েছে। সর্বোপরি এখনো পর্যন্ত এটি বাংলাদেশে সংঘটিত সবচাইতে হাই-প্রোফাইল হামলা যা বিশ্ব মিডিয়াতেও ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। গত প্রায় এক সপ্তাহ ধরে গুলশান হামলা পরিণত হয়েছে বাংলাদেশের প্রায় সর্বস্তরের মানুষের আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে। ছড়িয়ে পড়েছে ব্যাপক জল্পনা-কল্পনা। বিচিত্র সব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং ষড়যন্ত্র তত্ত্ব ঘুরে বেড়াচ্ছে

মুখে-মুখে, ফেসবুক আর অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলোতে। সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরাজ করছে চাপা আতঙ্ক, আশঙ্কা, উত্তেজনা। সুশীল-শাহবাগী-নিউজ মিডিয়া-আওয়ামী-বাম সকল ঝাঁপিয়ে পরেছে জঙ্গিবাদের শেকড় অনুসন্ধানে, জঙ্গিবাদ দমন করার সম্ভাব্য উপায়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে।

বলা যায়, গুলশানের হামলা এমন একটি ঘটনা যা বাংলাদেশকে এক অর্থে বদলে দিয়েছে। জঙ্গিবাদ, জঙ্গি মোকাবেলা, ইসলামের আদর্শের সাথে বোঝাপড়া, ইসলামের প্রশ্নে আলোচনা – ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সব ক্ষেত্রে এ হামলা কাঠামোগত পরিবর্তন এনে দিয়েছে। গুলশান হামলার আগের বাংলাদেশ আর গুলশান হামলার পরের বাংলাদেশ আর এক হতে পারবে না।

বাংলাদেশের জিহাদ আন্দোলনের দিক দিয়েও গুলশান হামলার, ফলাফল, প্রতিক্রিয়া, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আলোচনার দাবি রাখে। শুধুমাত্র শারীয়াহর মাপকাঠিতে হালাল-হারাম বিচার, কিংবা সমর্থন করা না করার প্রশ্নই না, দীর্ঘমেয়াদে এ হামলার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক নিয়ে আলোচনা-বিশ্লেষণ এবং স্বচ্ছ ধারণা থাকাটাও এ ভূমির মুজাহিদিনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অনেক দিক থেকেই বলা যায় গুলশান হামলা এমন একটা কেস-স্টাডি যা থেকে জিহাদের ব্যাপারে বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ, এলিট সমাজ, ও রাষ্ট্র- জঙ্গিবাদের প্রতি এ তিনটি শ্রেণীর ভবিষ্যৎ প্রবণতা ও প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের কাজ করতে চাইলে জিহাদ

আন্দোলনের নীতি নির্ধারক, এবং কর্মীদের এ বিষয়গুলো সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

এ কারণে কিছু চিন্তা সম্মানিত ভাইদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। মূল আলোচনায় পরিষ্কার করা দরকার যে যদিও জামাতুল বাগদাদীকে তাদের তাকফিরি উসুলের কারণে আমরা একটি খাওয়ারিজ জামা'আ মনে করি, তথাপি আমরা স্বীকার করি অনেক আন্তরিক ভাই এ জামা'আতে যোগ দিয়েছেন। এমন অনেক ভাই এ জামা'আতে যোগ দিয়েছেন যারা তাদের তাকফিরি উসুলের সাথে একমত না হলেও, শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী খিলাফাহ – এ পবিত্র ধারণাগুলোর প্রতি ভালোবাসার কারণে জামাতুল বাগদাদীর নেতৃবৃন্দের সৃষ্ট বিভ্রান্তির দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছেন। গুলশানে হামলাকারী নিব্রাস ইসলাম, মীর সামেহ মুবাশ্বের ও রোহান ইমতিয়াজ, খায়রুল ইসলাম ও শফিকুল ইসলাম উজ্জ্বলকে আমরা এরকম আন্তরিক ভাই হিসেবেই মনে করি, এবং তাদের রূহের মাগফিরাত কামনা করি। যদি তাদের হাত মুসলিমদের রক্ত থেকে পরিষ্কার হয়ে থাকে তবে আমরা আশা করি আল্লাহ তাদের বিভ্রান্তিগত ভুলত্রুটি মাফ করে দেবেন। এবং তাদেরকে শুহাদা হিসেবে কবুল করবেন।

পর্যালোচনা

“জিহাদ করা হল নতুন ব্যবসা শুরু করার মতো। আর আল্লাহ জিহাদকে ব্যবসাই বলেছেন। ব্যবসা শুরু করার আগে আপনাকে বেশ কিছু বিষয়ে চিন্তা করতে হবে। আপনি কিন্তু শুধু ব্যবসাটা হালাল হচ্ছে নাকি এটাই দেখবেন না। এটা হল শার'ঈ অংশ। কিন্তু আপনাকে আরো কাজ করতে হবে। মার্কেট রিসার্চ করতে হবে যাতে করে আপনার জিনিসের চাহিদা আছে কি না এটা বুঝতে পারেন। কারণ যদিও আপনার মূল লক্ষ্য আল্লাহকে খুশি করা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা, কিন্তু পাশাপাশি জীবিকা অর্জন করাও আপনার লক্ষ্য।

তাই আপনাকে চিন্তা করতে হবে, কিভাবে প্রফিট করা যাবে। আপনার চিন্তা করতে হবে কোন জায়গায় দোকান দিলে সেটা লাভজনক হবে। চিন্তা করতে হবে কারা আপনার মূল ক্রেতা হবে, তাদের কাছে কিভাবে আপনার পণ্যকে উপস্থাপন করা যেতে পারে। কিভাবে মার্কেটিং করতে হবে, মালামাল পৌছাতে হবে। এ বিষয়গুলো আপনি এড়াতে পারবেন না। শুধুমাত্র পণ্য হালাল হওয়াই প্রফিট করার জন্য যথেষ্ট না।

এ একই কথা খাটে জিহাদের ক্ষেত্রে। আপনাকে শুধুমাত্র শার'ঈ দিকটা দেখলে হবে না। কারণ আপনি দুটো লক্ষ্যের মধ্যে যেকোন একটা চাচ্ছেন। আপনার একটি লক্ষ্য হল শাহাদাহ অথবা শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা। পাশাপাশি আপনার লক্ষ্য হল মুসলিম উম্মাহকে অত্যাচার ও নির্যাতন থেকে রক্ষা করা। অর্থাৎ এ দুটো উদ্দেশ্য নিয়েই আপনাকে কাজ করতে হবে। আর তাই আপনাকে সামরিক সক্ষমতা, জনবল, বাজেট, স্ট্র্যাটিজি, রণকৌশল, কোন শত্রুর উপর আঘাত হানা অগ্রাধিকার পাবে – এ সব কিছুই চিন্তা করতে হবে।

অর্থাৎ বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে, নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে। কেন খিলাফতের পতন ঘটলো? বর্তমানে উম্মাহর রাজনৈতিক অবস্থা কি? আমাদের দুর্বলতার কারণ কি? আমরা কি কি অসুবিধায় ভুগছি? আমাদের পথে মূল বাধা কি? আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি কি? আমাদের শত্রুদের মূল শক্তি কি? তাদের বৈশিষ্ট্য কি? আর এ সব কিছুর আলোকে শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বাধিক উপযুক্ত ও বাস্তবসম্মত স্ট্র্যাটিজি কি?

এসব কিছু চিন্তা করেই আপনাকে অগ্রসর হতে হবে। কারণ জিহাদ একটা নতুন ব্যবসা শুরু করার মত।”

শায়খ আতিয়াতুল্লাহ আল-লিবি রাহিমাহুল্লাহ [আস সাহাব মিডিয়া]

শায়খ আতিয়াতুল্লাহ আল-লিবি রাহিমাহুল্লাহর উপরের কথা থেকে একটি মূল্যবান মূলনীতি আমরা পাচ্ছি। জিহাদের ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারন, কৌশল প্রণয়ন কিংবা কোন নির্দিষ্ট হামলা – সকল ক্ষেত্রেই, সার্বিক ভাবে যেকোন পদক্ষেপের পর্যালোচনার ক্ষেত্রে আমাদের দুটি অক্ষের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। একটি হল শার’ঈ দিক। অর্থাৎ শার’ঈ দৃষ্টিকোণ থেকে কোন পদক্ষেপ হালাল কি না। অন্যটি হল, বাস্তব প্রেক্ষাপটের আলোকে কৌশলগত বা স্ট্র্যাটিজিক দিক। আমরা আশা করবো এ উসুলটির ব্যাপারে জামাতুল বাগদাদীর সদস্য এবং সমর্থকরাও একমত হবেন, যেহেতু তারা দাবি করে থাকেন তাদের মানহাজ এবং উসামার মানহাজ একই। আর এ শায়খ আতিয়াতুল্লাহ তানযীম আল-ক্বাইদার একজন শূরা সদস্য হয়ে শায়খ উসামার জীবদ্দশায় দেয়া বক্তব্যের মাধ্যমে শায়খ উসামা এবং “শায়খ উসামার আল-

ক্বাইদার”-ই অনুসৃত একটি মুলনীতি তুলে ধরেছেন। মূলত আমাদের পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এই মূলনীতির আলোকেই আমরা অগ্রসর হব।

শার’ঈ বৈধতাঃ

ইতিমধ্যে যে তথ্য আমরা জামাতুল বাগদাদী এবং কুফফার মিডিয়া উভয় দিক থেকে পেয়েছি তা যদি সঠিক হয়ে থাকে তবে বলা যায় শার’ঈ দিক থেকে এ হামলা হালাল ছিল। যেহেতু এ হামলা পরিচালিত হয়েছিল কাফিরদের হত্যা করার উদ্দেশ্য, এমন একটি স্থানে যা কাফিরদের, বিশেষ করে কাফির কূটনীতিবিদদের আনাগোনার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এছাড়া হামলাকারীরা বন্দীদের মধ্যে যারা ক্বুর’আনের আয়াত তিলাওয়াত করতে সক্ষম হয়েছেন তাদের ছেঁড়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ এর মাধ্যমে মুসলিম বন্দীদের পৃথক করে, তারা তাদের নিরাপত্তা দিয়েছেন। ইতিপূর্বে এ পদ্ধতিটি আল-ক্বাইদার শাখা আল শাবাব, আল মুরাবিতুন এবং AQIM [Al Qa’idah in the Islamic Maghrib] ব্যবহার করেছে। এছাড়া মুরতাদ বাহিনীর হামলা শুরু হবার আগে হামলাকারীরা মুসলিম বন্দীদের নিরাপদে বেকারি থেকে বের হয়ে যাবার সুযোগ দিয়েছেন। এভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই মুসলিমদের রক্তের নিরাপত্তা দেয়ার চেষ্টা তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে, যা প্রশংসনীয় এবং শারীয়াহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সাধারণ জামাতুল বাগদাদীর হামলাগুলোতে এ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় না। এ থেকে আরেকটি ইঙ্গিত পাওয়া যায় হামলাকারীরা সম্পুর্ণ ভাবে জামাতুল বাগদাদীর গুলুহ দ্বারা আক্রান্ত ছিল না।

এ হামলার পর একটি প্রশ্ন তোলা হয়েছে আর তা হল – নিহত কাফিররা ছিল মুস্তামা'আন বা আমান প্রাপ্ত। বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে ভিসা পেয়েই তারা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিল আর এ ভিসা হল আমান বা নিরাপত্তা চুক্তি যার মাধ্যমে একজন কাফিরের জান ও মাল সুরক্ষিত হয়। এ ব্যাপারে শার'ঈ অবস্থানের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই-

"যারা কাফিরদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, কিংবা কুফর আইন দ্বারা শাসন করছে এমন মুরতাদ শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে মুসলিম ভূখণ্ডে প্রবেশের সময় কাফিরদের যে ভিসা এবং অন্যান্য কাগজপত্র প্রদান করা হয় শার'ঈ "আমান" বা নিরাপত্তাচুক্তি হিসেবে গণ্য হবে না, এবং মুসলিমদের কাছে এ ভিসা কোন শার'ঈ ভাবে বৈধ চুক্তি হিসেবে গ্রহণযোগ্য না। এ চুক্তি বাতিল কারণ কোন মুরতাদ কখনও মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। আর যদি সে কোন ভুখণ্ডের সেনাবাহিনীকে নিয়ন্ত্রন করে, অথবা অন্য কোন ভাবে ঐ ভূখণ্ডের উপর নিয়ন্ত্রন অর্জন করতে সক্ষমও হয় তথাপি সে যথাযথ কতৃপক্ষ হিসেবে কখনই বিবেচিত হবে না।

এ ব্যাপারে শায়খ আবদুল ক্বাদির ইবন আবদুল 'আযীয বলেনঃ

"আজ যখন কোন কাফির এমন কোন মুসলিম ভূখণ্ডে প্রবেশ করে যা দারুল কুফর বা দার আর রিদ্দাতে পরিণত হয়েছে, তখন সে (কাফির) ঐ ভূখণ্ডের কতৃপক্ষের কাছ থেকে ভিসা গ্রহন করেই প্রবেশ করে। আর এ ভিসাকে ঐ কাফিরের জন্য "আমান" বা নিরাপত্তা চুক্তি হিসেবে গণ্য করা হবে না যার মাধ্যমে ওই ভূমিতে অবস্থানকালীন সময়ে তার জান ও মাল

সুরক্ষিত বলে গণ্য হবে। কারণ তাকে এ আমান বা নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে ঐ ভূমির কাফির-মুরতাদ শাসক বা শাসক গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে, যারা শার'ঈ ভাবে মুসলিমদের উপর কর্তৃপক্ষ হিসেবে বৈধ না।" [আল জামি ফি তালাদ আল-'ইলম আশ শরীফ, খন্ড ২/৬৫৩]

[কাফিরদের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান সংক্রান্ত শারীয়াহর মূলনীতি- আত তিবইয়ান পাবলিকেশন্স]

সুতরাং বাংলাদেশের মুরতাদ সরকার কর্তৃক এসব বিদেশী কাফিরকে দেওয়া ভিসা শার'ঈ ভাবে আমান বলে গণ্য হবে না। এবং কোন নিরাপত্তা চুক্তি না থাকার কারণে এ কাফিরদের রক্ত, সম্পদ ও সম্মানের ব্যাপারে শারীয়াহর মূলনীতি প্রযোজ্য হবে, অর্থাৎ এদের জান মাল ও সম্মান শারীয়াহর দৃষ্টিকোন থেকে সুরক্ষিত নয় (হালাল)। এবং এটা শুধু এ কাফিরদের ক্ষেত্রে না বরং বাংলাদেশের অবস্থিত এমন সব বিদেশী কাফির যারা কোন রকম শার'ঈ ভাবে বৈধ আমান ছাড়া শুধুমাত্র মুরতাদ সরকারের কাছ থেকে পাওয়া ভিসার ভিত্তিতে এ ভূখন্ডে অবস্থান করছে, সকলের ক্ষেত্রেই এ একই হুকুম প্রযোজ্য হবে।

সুতরাং সার্বিকভাবে বলা যায় এ হামলাটি শার'ঈ ভাবে বৈধ ছিল, এবং আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত।

কৌশলগত পর্যালোচনাঃ

গুলশান হামলাঃ একটি পর্যালোচনা

এবার আসা যাক বাস্তব প্রেক্ষাপটের আলোকে এ হামলার কৌশলগত প্রভাব, প্রতিক্রিয়া, সফলতা, ব্যার্থতা, ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকের পর্যালোচনায়। এক্ষেত্রে বেশ কিছু দিক থেকে পর্যালোচনার অবকাশ আছে।

বৈশ্বিক জিহাদের প্রেক্ষাপট থেকে পর্যালোচনাঃ

আমরা যদি এ হামলায় নিহতদের দিকে তাকাই তাহলে দেখা যাচ্ছে, নিহতদের মধ্যে

ইটালির নাগরিক – ৯

জাপানের নাগরিক – ৭

ভারতের নাগরিক – ১

বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত অ্যামেরিকান নাগরিক – ১

অর্থাৎ নিহতদের অধিকাংশ ছিল ইটালি ও জাপানের নাগরিক। এখন একটি প্রশ্ন তোলা এখানে সমীচিন হবে, বাংলাদেশের জিহাদের জন্য ইটালিয়ান ও জাপানিযদের হত্যা করার দীর্ঘমেয়াদী স্ট্র্যাটিজিক বা কৌশলগত উপকারিতা কি? এ থেকে কি ফলাফল আসতে পারে যা মুজাহিদিনের জন্য পরবর্তীতে উপকারী হতে পারে? এ মূহুর্তে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইটালি কিংবা জাপান কোনটিই কোন কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করছে না। তাদের উপরের আক্রমনের কোন সামরিক বা কৌশলগত ফায়দা আপাত ভাবে চোখে পড়ে না।

অন্যদিকে বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলেও একই রকমে ফলাফল পাওয়া যায়। ২০১৬ এর জানুয়ারিতেই জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে ঘোষণা করেছিল "অদূর ভবিষ্যতে আইসিসের বিরুদ্ধে আক্রমনের কোন পরিকল্পনা জাপানের নেই"

[http://time.com/4195411/japan-isis-c...t-shinzo-abe/]

অন্যদিকে যদিও ইটালি জামাতুল বাগদাদীর বিরুদ্ধে মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোটের একটি সদস্য তথাপি এ ধরনের হামলা তাদের উপর কতোটা প্রভাব ফেলবে তা প্রশ্নসাপেক্ষ। ইতিপূর্বে ২০০৪ এর মাদ্রিদ হামলার পর স্পেনের সরকার ইরাকে মার্কিন জোট থেকে নিজের সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নেয়। সুতরাং সঠিক সময়, সঠিক স্থান, সঠিক মাত্রার হামলার মাধ্যমে কাফিরদের সিদ্ধান্তের উপর প্রভাব ফেলা যায় এটি প্রমানিত। কিন্তু সিরিয়া ও লিবিয়াতে ইটালির এখন যে ভূমিকা আছে তা কি বাংলাদেশে ৯ জন ইটালিয়ানকে হত্যা করে বন্ধ করা যাবে? আল-ক্বাইদা ২০০৪ এ স্পেনের রাজধানীর কেন্দ্রে শক্তিশালী বোমা হামলার মাধ্যমে স্পেনকে বাধ্য করেছিল ইরাক যুদ্ধে অংশগ্রহন করা থেকে পিছু হটতে। এ আক্রমনে মারা গিয়েছিল প্রায় ১৯২ জন। একই ধরনের ফলাফল কি বাংলাদেশে ৯ জনকে হত্যা করে পাওয়া সম্ভব?

তার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আমাক্ব নিউজ এজেন্সি থেকে হামলার দায় স্বীকার এবং হামলাকারীদের ছবি প্রকাশের সময় গুলশান হামলাকে অবিহিত করা হয়েছে বিভিন্ন দেশের কাফিরদের উপর হামলা হিসেবে। বাংলাদেশে জামাতুল বাগদাদীর মূল মিডিয়া আত-তামকিন

ব্লগেও এ হামলাকে বর্ননা করা হয়েছে “বিভিন্ন দেশের কাফিরদের উপর ইনগ্বিমাসি হামলা” হিসেবে। পাশপাশি মাথায় রাখুন হামলাকারীরা বেকারির ভেতরে বন্দীদের বলেছিল মুসলিম হলে কুর'আন তিলাওয়াত করতে। যা থেকে বোঝা যায়, হামলার সময় ঠিক কারা বেকারির ভেতরে ছিল তা হামলাকারীদের জানা ছিল না।

অর্থাৎ এ হামলা আলাদা ভাবে ইটালিয়ান বা জাপানিজদের উপর বিশেষ ভাবে হামলা ছিল না। বরং বিদেশি নাগরিকদের উপর একটি হামলা ছিল। হামলাকারীরা এটা জানতো যে এ লোকেশানে নিয়মিত বিদেশী নাগরিকরা আসা যাওয়া করে, এবং এর ভিত্তিতেই টার্গেট হিসেবে তারা এ হলি আর্টিযানকে বাছাই করে। কোন নির্দিষ্ট দেশের নাগরিকদের হত্যা করার উদ্দেশ্য এ হামলা হয় নি। হামলাতে ঘটনাচক্রে ৯ জন ইটালিয়ান মারা গেছে। ৯ জন ইটালিয়ানের জায়গায় এখানে ৯ জন চিলির নাগরিকও মারা পড়তে পারতো। সকল দিক বিবেচনায় বলা যায় নিম্নোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য জামাতুল বাগদাদী এ হামলাটি চালায় –

১) শিরোনামে দখল করা। বন্দী দশা সৃষ্টি হওয়া এবং এ অবস্থা প্রায় ১০ ঘন্টা স্থায়ী হবার কারণে গুলশান হামলার খবর খুব দ্রুতই বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। শুরু হয় বিশ্ব মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে ব্যাপক আলোচনা।

২) রমাদ্বান উপলক্ষে কাফিরের বিরুদ্ধে জামাতুল বাগদাদীর মুখপাত্র বিশ্বজুড়ে যেসব আক্রমনের হুশিয়ারী দিয়েছিল তার অংশ হিসেবে বাংলাদেশেও কাফিরদের আক্রমণ করা।

৩) সার্বিক ভাবে কাফির দেশগুলোকে এই বার্তা দেওয়া "আইএস" তাদের সর্বত্র হামলা করবে।

৪) বাংলাদেশে নিজেদের উপস্থিতি জোরালো ভাবে জানান দেওয়া।

দেখা যাচ্ছে এ হামলার পেছনে আঞ্চলিক বা বাংলাদেশের জিহাদের ক্ষেত্রে সম্পর্কিত বিচার-বিবেচনার চাইতে জামাতুল বাগদাদীর বৈশ্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ অগ্রাধিকার পেয়েছে। এবং সেই দৃষ্টিকোন থেকে আপাত দৃষ্টিতে সবগুলো ক্ষেত্রেই জামাতুল বাগদাদীকে সফল মনে হলেও, যদি আপনি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেন তাহলে দেখতে পাবেন প্রকৃতপক্ষে এ সবগুলো অত্যন্ত সাময়িক কিছু সাফল্য। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এ হামলার ফলাফল দীর্ঘমেয়াদে তেমন কোন ফলাফল ফেলবে না।

এক্ষেত্রে উত্থাপিত আপত্তির বিপরীতে আমি দুটি উদাহরণ উপস্থাপন করবো।

১) জামাতুল বাগদাদীর উলাইয়্যা আল জাযাইর

২) তিউনিসিয়া

১) উলাইয়্যা আল জাযাইর- উলাইয়্যা আল জাযাইর বা আলজেরিয়াতে "খিলাফাহর" প্রদেশের ঘোষণা আসে বেশ তাড়াতাড়ি। ২০১৪ এর সেপ্টেম্বরেই আলজেরিয়ার জুনুদ আল খিলাফাহ নামে একটি দল আবু-বাকর আল বাগদাদীকে বাইয়াহ প্রদান করে। তার দু সপ্তাহ পরই তারা এক ফ্রেঞ্চ নাগরিককে অপহরণ করার পর, চিরাচরিত "ইরাকী" কায়দায় তার

শিরোচ্ছেদের ভিডিও প্রকাশ করে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেয়। মিডিয়াতে এ খবরটি ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। নভেম্বর ২০১৪ তে আবু বাকর আল বাগদাদী, উলাইয়্যা আল-জাযাইর গঠনের ঘোষণা দেয়, কিন্তু তার এক মাস পরই আলজেরিয় নিরাপত্তা বাহিনী এ উলাইয়্যার প্রধানকে হত্যা করে। পরবর্তীতে নিয়মিত হারে এ উলাইয়্যার শক্তি খর্ব হতে থাকে, গ্রেফতার ও এনকাউন্টারের কারণে পরবর্তীতে ২০১৫ এর মে-তে আলজেরিয় নিরাপত্তা বাহিনীর এক অভিযানের পর এ "উলাইয়্যা"-টি এক প্রকার নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যদিও উলাইয়্যা আল জাযাইর শিরোনাম দখল করতে সক্ষম হয়েছিল, অতি দ্রুত আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিয়েছিল তথাপি তাদের এ দ্রুত গতির উথ্থান স্থায়ী হয় নি।

২) তিউনিশিয়া – ২০১৫ তে জামাতুল বাগদাদী তিউনিশিয়াতে দুটি হাই প্রোফাইল হামলা চালায়। প্রথমটি ছিল বার্দো জাদুঘরে হামলা, যাতে মারা যায় ২০ জন বিদেশী পর্যটক। এ হামলাতে একে-৪৭ এবং গ্রেনেড ব্যবহৃত হয়, এবং আক্রমণকারী ছিল ৩ জন। একই বছর তিউনিশিয়ার সুসা শহরের টুরিস্ট রিসোর্টে হামলায় মারা যায় ৩৮ জন বিদেশী পর্যটক। হামলাকারী ছিল এক জন। দুটি আক্রমণই ব্যাপক আন্তর্জাতিক মিডিয়া কাভারেজ পেয়েছিল। দুটি হামলার পরই টানা কয়েক দিন মিডিয়ার শিরোনাম দখল করে রাখে "আইএস"। কিন্তু পরবর্তীতে তিউনিশিয়ার নিরাপত্তা বাহিনী হার্ডলাইনে যাওয়ায় তিউনিশিয়াতে থাকা অধিকাংশ "আইএস" সেল পার্শ্ববর্তী লিবিয়াতে চলে যেতে বাধ্য হয়। ঘটনাগুলো সে সময়ে অত্যন্ত

চাঞ্চল্যকর হলেও পরবর্তীতে তিউনিশিয়া, ইসলামিক মাগরিব এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডল কোন ক্ষেত্রেই এ আক্রমণগুলো কোন দীর্ঘমেয়াদী ফল রাখেনি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শুধুমাত্র শিরোনাম দখল করার দীর্ঘমেয়াদী কোন সুফল বৈশ্বিক জিহাদের ক্ষেত্রে নেই। একই কথা গুলশান হামলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

বৈশ্বিক জিহাদের যে মূল লক্ষ্যাবলী- অ্যামেরিকা নেতৃত্বাধীন ক্রুসেডার জোটকে বিশ্বজুড়ে আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত রাখা, দীর্ঘমেয়াদে তাদের আঞ্চলিক অবস্থানকে দুর্বল করা, সহিংসতা কাফিরদের ভূমিতে পৌছে দেওয়া, তাদের অর্থনীতির ক্ষতিসাধন করা, ক্রুসেডার অ্যামেরিকার সরাসরি দালাল হিসেবে পুতুল শাসকগোষ্ঠীর রূপ উন্মোচন করার মাধ্যমে, মুসলিম জনগণের সামনে তাদের মুখোমুখি দাড় করিয়ে দেওয়া, মুসলিম বিশ্বে প্রচলিত শাসন ব্যবস্থা থেকে মুসলিম জনগনকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা, সরকার ও জনগণের মধ্যে গভীর বিভেদ ও বিরোধিতা তৈরি করা, মুসলিম বিশ্বগুলোতে ইসলাম ও কুফরের প্রশ্নে ব্যাপকভাবে মেরুকরণ – এগুলোর কোনটিই গুলশান হামলার মাধ্যমে সেভাবে অর্জিত হচ্ছে না।

আঞ্চলিক কর্মসূচীর আলোকে পর্যালোচনাঃ

বৈশ্বিক জিহাদের সার্বিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অঞ্চল হিসেবে উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চল বিশেষ করে বাংলাদেশের জিহাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে গুলশান হামলার মূল্যায়ন কিভাবে হওয়া উচিৎ? এ প্রশ্নটির জবাব দেবার জন্য আমাদের দুটি অক্ষের

দিকে দিকে তাকাতে হবে। একটি হল মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের ময়দান অন্যটি হল সামরিক কৌশলগত পর্যালোচনা।

মনস্তাত্ত্বিক ময়দানঃ

"মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ অংশে যে লড়াই চলছে তা হল মূলত একটি আদর্শিক যুদ্ধ। আর এ যুদ্ধের ফলাফলের উপর নির্ভর করবে মুসলিম বিশ্বের ভবিষ্যৎ।"

সুতরাং এ মূহুর্তে মুসলিম বিশ্বে একটি আদর্শিক যুদ্ধ চলছে। এবং অ্যামেরিকার ডিপার্টমেন্ট অফ ডিফেন্সের চতুর্মাসিক প্রতিবেদনের বক্তব্য হল –

> "অ্যামেরিকা (মুসলিমদের বিরুদ্ধে) এমন একটি যুদ্ধে লিপ্ত আছে যা একই সাথে অস্ত্রের এবং আদর্শের। আর এ যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় শুধুমাত্র তখনই অর্জিত হবে যখন চরমপন্থী আদর্শ বৃহত্তর মুসলিম জনগণ ও চরমপন্থীদের নিরব সমর্থকদের সমর্থন হারাবে।"

অর্থাৎ RAND Corporation এবং পেন্টাগনের মতে, মুসলিম বিশ্বে আজ একট মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ চলছে। এবং আসলেই আজ এরকম একটি যুদ্ধ চলছে।

[শায়খ আনওয়ার আল-আওলাকী, "মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ"/Battle of Hearts and Minds"]

পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে একথা স্পষ্ট যে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদী এবং সুদূরপ্রসারী ফলাফল তখনই থাকে যখন সে হামলার পেছনে একটি শক্ত মেসেজ থাকে, এবং সে মেসেজ

সাধারণ মানুষের কাছ পর্যন্ত পৌঁছে। কারণ যেমনটা শায়খ আওলাকী রাহিমাহুল্লাহ সহ বৈশ্বিক জিহাদের উমারাহ ও উলামাগণ বারবার বলেছেন, সার্বিক বিচারে মূল যুদ্ধের ময়দানের চাইতেও Battle of hearts & minds – বা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের ময়দান অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং একই সাথে নাজুক।

আমি আবারও পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছি, এ অংশে যে পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হচ্ছে তা শার'ঈ দৃষ্টিকোন থেকে কোন হামলা বৈধ বা অবৈধ হবার সাথে সম্পর্কিত না। এ পর্যালোচনাটি হল বিশ্ব কুফর ও তাগুত শক্তির বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী মুজাহিদিন যে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে লিপ্ত আছে, সে যুদ্ধের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বাস্তবতার আলোকে, কোন ধরনের হামলা দীর্ঘমেয়াদে কি ধরনের সুদূরপ্রসারী ফলাফল বয়ে আনতে পারে তার একটি মূল্যায়ন।

উদাহরণস্বরূপ অরল্যান্ডো হামলার দিকে তাকানো যেতে পারে। দেখুন অরল্যান্ডো হামলার ক্ষেত্রে শার'ঈ দিক থেকে যেমন এটি হালাল ছিল, তেমনি ভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও এটি ছিল সফল। এ হামলা মুমিনদের অন্তরকে প্রশান্ত করেছে এবং কাফিরদের সন্ত্রস্ত করেছে। সাময়িক বিচারে এটি অত্যন্ত সফল একটি হামলা| যদিও এ হামলা এখনো পর্যন্ত অ্যামেরিকার মাটিতে সবচাইতে সফল "লোন উলফ" বা একাকী মুজাহিদের হামলা তথাপি কিছু বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন। যেমন এ হামলার মাধ্যমে কুফফারের কাছে কি মেসেজ যাচ্ছে? মেসেজ হিসেবে এটি কি খুব শক্তিশালী? এটি বৈশ্বিক জিহাদের যে মুল মেসেজ শায়খ উসামার সময় থেকে চলে আসছে এবং যার ব্যাপারে সকল মুজাহিদিন এক

মত তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের ময়দানে এ হামলার প্রভাব কেমন? আল-মালাহিম মিডিয়া থেকে অরল্যান্ডো হামলার ব্যাপারে ইন্সপায়ার ম্যাগাযিনের যে বিশেষ সংখ্যাটি বের হয়েছে তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি-

"হামলাকারী নির্দিষ্ট করে একটি সমকামি নাইটক্লাবকে টার্গেট হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। যদিও এধরনের লোকদের হত্যা করা একটি আবশ্যক দায়িত্ব এবং সাধারণ ফিতরাতি বিষয়, তথাপি ভবিষ্যতে হামলার ক্ষেত্রে এমন টার্গেট এড়িয়ে যেতে পারলে ভালো যেখানে সংখ্যালঘুরা (Minority- অ্যামেরিকাতে সমকামিদের minority group বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে গণ্য করা হয়) থাকে। যাতে করে মিডিয়া আক্রমনের মূল উদ্দেশ্যকে মানুষের সামনে ঘুরিয়ে দিতে না পারে। যেমন উমর মতিনের অপারেশানের ক্ষেত্রে অ্যামেরিকান মিডিয়া করেছে। তারা এ হামলাকে সমকামিদের প্রতি বিদ্বেষগত একটি হামলা হিসেবে চিত্রিত করেছে। তারা উমর মতিনের বাবা একটি কথা নিয়ে বার বার সেটাকে উদ্ধৃত করেছে – উমর সমকামিদের ঘৃণা করতো (তাই সে হামলা করেছে) আর জঙ্গিবাদি কোন আদর্শ তার ছিল না...এভাবে মিডিয়া চেষ্টা করেছে এ আক্রমণকে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর অপরাধীদের প্রতি হামলা হিসেবে চিত্রিত করতে এবং মুল জায়গা থেকে অ্যামেরিকান জনগণের মনোযোগ সরিয়ে দিতে।" [ইন্সপায়ার গাইড – অরল্যান্ডো অপারেশান, আল-মালাহিম মিডিয়া]

লক্ষ্য করুন এখানে হামলার হালাল বা হারাম হবার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন তোলা হচ্ছে না। বরং বরকতময় ও সফল একটি হামলা হিসেবে প্রশংসা করার পরই এ কথাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ দীর্ঘমেয়াদের জিহাদের ক্ষেত্রে আমাদের শুধুমাত্র হালাল-হারাম, বা সামরিক সাফল্যের দিকে মনোযোগ দিলেই হবে না। সাহাবাদের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া আজমাইন কেউ কেউ যখন মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবন উবাইকে হত্যা করতে চেয়েছিল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, “তাকে ছেড়ে দাও, যাতে মানুষ না বলে মুহাম্মাদ তার সাথীদের হত্যা করে।“ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কথা থেকে কিন্তু এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যে আব্দুল্লাহ ইবন উবাইকে হত্যা করা হারাম ছিল। কিন্তু কৌশলগত দিকে তাকে হত্যা করার সম্ভাব্য ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া এড়ানোর প্রয়োজন ছিল। এখন দেখা যাক গুলশান হামলার মাধ্যমে কি মেসেজ কাফির, তাগুত ও তাদের অনুসারী সুশীল প্রগতিশীল সমাজ এবং এভূখণ্ডের মুসলিমদের কাছে যাচ্ছে?

মূল যে মেসেজটী তারা পাচ্ছে তা হল – কুফরের কারণে কাফিরদের হত্যা করা হচ্ছে। জামাতুল বাগদাদীর অফিশিয়াল মিডিয়াতেও ব্যাপারটি কাফিরদের উপর হামলা হিসেবে এসেছে। সম্প্রতি এ হামলার ব্যাপারে রাক্কা থেকে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে যদিও গণতন্ত্র ত্যাগ এবং শারীয়াহ কায়েমের কথা এসেছে, কিন্তু এর আগ পর্যন্ত এ হামলার ব্যাপারে যে বক্তব্য এসেছে তার সাথে এটা ঠিক সামঞ্জস্যপূর্ণ না। একই সাথে হামলার ধরনও এমন ছিল না যেখানে তাগুত বা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোন প্রতিষ্ঠানকে নিশানা বানানো হয়েছে। বরং

প্রতীয়মান হয়, হামলার পর এ হামলার কারণে যে মিডিয়া হাইপ তৈরি হয়েছে সেটার সুযোগ নিয়ে গণতন্ত্রের ব্যাপারে বক্তব্য যোগ করা হয়েছে। কিন্তু মূল আক্রমনের উদ্দেশ্য ছিল কাফির হত্যা। প্রশ্ন হল মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের ময়দানে মেসেজ হিসেবে এটি কতোটা শক্তিশালী? এ মেসেজ কি সাধারণ মুসলিমদের চিন্তাকে অনুরণিত সক্ষম? বাংলাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর কাছে কি এ মেসেজ এবং তার কার্যকারণ বোধগম্য?

এর সাথে আপনি তুলনা করার চেষ্টা করুন ২০১৩ সালে থাবা বাবার উপর বরকতময় হামলার ফলাফলের। এ হামলাটি এমন ছিল যা সমস্ত বাংলাদেশের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল আক্ষরিক ভাবেই। হেফাযতের আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল থাবা হত্যার মাধ্যমেই। শাহবাগের বিরিয়ানী বিপ্লবের শেষের শুরুটাও হয়েছিল এ অপারেশানের মাধ্যমেই। একই সাথে চিন্তা করুন অভিজিৎ রায়ের উপর হামলা। এটি ছিল এমন একটি হামলা যা আল্লাহর ইচ্ছায় বাংলাদেশের ইসলামবিদ্বেষীদের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল, বেকায়দায় ফেলে দিয়েছিল সরকারকে, চিন্তিত করে তুলেছিল অ্যামেরিকাকে, এবং সাধারণ মানুষের কাছে পরিষ্কার করে দিয়েছিল, সরকার, মিডিয়া, অ্যামেরিকা, সুশীল সমাজ- এরা সবাই আসলে ইসলামের বিপক্ষে ও শাতেমদের পক্ষে অবস্থান নিচ্ছে। একই কথা প্রযোজ্য মালউন জুলহাজ মান্নান হত্যা অপারেশানের ক্ষেত্রে। সম্ভবত সর্বাধিক বিব্রতকর অবস্থায় সরকার পড়ে এ বরকতময় অপারেশানের পর।

নিহত ব্যক্তি অ্যামেরিকান অ্যাম্বেসির কর্মী, সমকামী, সমকামিতার প্রচারক, সাবেক আওয়ামী মন্ত্রী দীপু মণির আত্মীয়, ইন্ডিয়া ও সুশীল সমাজের প্রিয়পাত্র – ইত্যাদি সবকিছু মিলে সরকারের জন্য "শ্যাম রাখি না কূল রাখি" – এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়। একদিকে অ্যামেরিকার চাপে সরকার মুজাহিদিনকে ধরতে সক্রিয় ভাবে মাঠে নামতে বাধ্য হয়, অন্যদিকে কৌশলী টার্গেট নির্ধারণের জন্য সরকার সরাসরি নিহতের পক্ষে কিছু বলতেও ভয় পেতে শুরু করে। যে কারণে একই বাক্যে হত্যার নিন্দার পাশাপাশি তারা সমকামীতার নিন্দা জানাতেও বাধ্য হয়। হামলার অন দা গ্রাউন্ড বাস্তবায়ন এবং মনস্তাত্ত্বিক ময়দান, উভয় দিকেই এ হামলা ছিল সম্পূর্ণ সফল। এবং সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর।

মুসলিম জনগণের মাঝে প্রতিক্রিয়াঃ

মনস্তাত্ত্বিক ময়দানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সাধারণ মুসলিম জনগণের মধ্যে কোন হামলার কি প্রভাব হচ্ছে, জনগণ কিভাবে একে মূল্যায়ন করছে, কিভাবে তা জিহাদ আন্দোলনের উপর প্রভাব ফেলবে বা ফেলতে পারে ইত্যাদি দিক বিবেচনা করা।

যদিও সাধারণ জনগণের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর ভিত্তি করে মুজাহিদিন তাদের সিদ্ধান্ত নেন না এবং জিহাদী আন্দোলনকে সাধারণ মুসলিমদের অনুগামী করলে এ আন্দোলন ব্যর্থ হতে বাধ্য তথাপি সাধারণ মুসলিম জনগণের প্রতিক্রিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর যাকে হিসেবের বাইরে রাখাও সম্ভব না।

“(অরাজকতার ব্যবস্থাপনার পর্যায়ের ক্ষেত্রে করণীয়সমূহের একটি হল) এমন একটি মিডিয়া পরিকল্পনা গ্রহন করা যা প্রতিটি পর্যায়ে প্রতিটি হামলার শার’ঈ ও সাধারণ বিবেচনাপ্রসূত যৌক্তিকতা তুলে ধরবে। বিশেষ ভাবে এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হবে সাধারণ জনগণ (অর্থাৎ সাধারণ জনগণকে প্রভাবিত করা)...তবে জনগণ এ পুরো পরিকল্পনাতে একটি অত্যন্ত জটিল উপাদান। কারণ তারাই ভবিষ্যতে আমাদের সমর্থকের ভূমিকা পালন করবে এবং আমাদের ভিত্তি হবে...

লক্ষ্য করুন, ‘জনগণ একটি জটিল উপাদান’ বলার অর্থ কিন্তু এ না যে আমরা আমাদের আন্দোলন জনগণের উপর নির্ভরশীল করে তুলবো। আমরা জানি তাগুতি শাসন মুসলিম জনগণের মাঝে ও তাদের চিন্তার কাঠামোতে যে প্রকৃতিগত বিকৃতি সাধনে সক্ষম হয়েছে তার কারণে সাধারণ ভাবে জনগণ নির্ভরযোগ্য না। আমরা এও জানি বিজয় আসার আগে জনগণের এ অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব না। একই সাথে এও সত্য মুসলিম জনগণকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে তাদের প্রতিনিধিত্ব করার আশা করাও বোকামি। একারণে মিডিয়া রাজনীতির উদ্দেশ্য হবে জনগণের সমর্থন ও সহমর্মিতা পাওয়া, যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে নিদেন পক্ষে, জনগণকে মুজাহিদিন ও জিহাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া থেকে বিরত রাখা।” [ইদরাত আল তাওয়াহ্*হুশ, শায়খ আবু বাকর আল-নাজী, পৃষ্ঠা ২১]

শায়খ আবু বাকর নাজীর এ বইটির কথা একাধিকবার জামাতুল বাগদাদীর ম্যাগাযিন “দাবিক্ব’-এই উল্লেখিত হয়েছে, এবং তারা একাধিকবার দাবি করেছে এ বইটিতে উল্লেখিত

মুলনীতিসমূহ তারা অনুসরণ করে। সুতরাং যদিও জামাতুল বাগদাদীর পক্ষ থেকে একাধিকবার অপবাদ দেওয়া হয়েছে ক্বাইদাতুল জিহাদ সার্বিক ভাবে এবং বাংলাদেশে ক্বাইদাতুল জিহাদের শাখা "জনপ্রিয় জিহাদের মুখাপেক্ষী" তথাপি এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত সাধারণ মুসলিমদের প্রতিক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য রাখার মূলনীতিটি নবউদ্ভাবিত কোন বিষয় নয়, এবং এ নীতির ব্যাপারে জামাতুল বাগদাদীও একমত পোষণ করে। তবে তাদের বুদ্ধি ও চিন্তাগত সীমাবদ্ধতার কারণে হয়তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা এ মূলনীতিসমূহ সঠিক ভাবে অনুধাবন ও বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয় না, তবে নিজেদের এ সীমাবদ্ধতার কারণে ক্বাইদাতুল জিহাদকে দোষারোপ করা একান্তই অনুচিত।

যাই হোক, সাধারণ মুসলিম জনগণের সমর্থন, সহমর্মিতা, নিদেনপক্ষে তাদের জিহাদ বিরোধিতা থেকে বিরত রাখার যথাসম্ভব চেষ্টা যে করা উচিৎ – এ নীতির ব্যাপারে ক্বাইদাতুল জিহাদ ও জামাতুল বাগদাদী উভয়েই একমত। এ নীতির আলোকে যদি আমরা গুলশান হামলার প্রতিক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করতে যাই তাহলে ঠিক কি ধরনের ফলাফল আমরা দেখতে পাচ্ছি?

এ হামলার ব্যাপারে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিক্রিয়া কি? যারা জিহাদ সমর্থক (যদিও নিষ্ক্রিয়) হিসেবে পরিচিত তাদের মাঝে এ প্রতিক্রিয়া কি? এ হামলার পর জনমানুষের মাঝে জাতীয়ভাবে যে আলোচনা শুরু হয়েছে, সেখানে কোন বিষয়গুলো প্রাধান্য পাচ্ছে? কোন বিষয়গুলো সর্বাধিক ফোকাস পাচ্ছে?

আমরা দেখতে পাচ্ছি সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি উঠে আসছে তা হল হামলাকারীদের ব্যক্তিগত পরিচয় এবং তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক ব্যাকগ্রাউন্ড। যেখানে মূল ফোকাস থাকা উচিৎ ছিল ইসলাম বনাম ধর্মনিরপেক্ষতা, শারীয়াহ বনাম গণতন্ত্র, ইসলামবিদ্বেষী বনাম মুসলিম – এধরনের বিতর্কগুলোর দিকে সেখানে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে "ভালো ভালো পরিবারের সদস্যরা জঙ্গি হয়ে যাচ্ছে", 'উচ্চ শিক্ষিত জেনারেল লাইনের যুবকরা উগ্রপন্থার দিকে ঝুঁকছে", "মাদ্রাসা শিক্ষিত বনাম জেনারেল লাইন থেকে ইসলাম পালন করতে আসা যুবক" – এরকম বিভিন্ন বিষয়।

অথচ প্রয়োজন ছিল "ইসলাম বনাম কুফর" এ সহজ সমীকরণে সমগ্র আলোচনাকে ফেলা। যাতে করে সাধারণ মুসলিম জনগণের চিন্তাকে জিহাদের সমর্থন, সহমর্মিতা কিংবা নিদেনপক্ষে জিহাদ বিরোধিতা থেকে বিরত থাকার অবস্থানে নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু সামরিক দিক দিয়ে সফল হওয়া সত্ত্বেও কোন শক্তিশালী, সুসঙ্গত ও সহজবোধ্য মেসেজ এ হামলার মাধ্যমে দিতে না পারায় জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি কাজ করছে, যার সুযোগ নিয়ে মিডিয়া ও সুশীল সমাজ। আলোচনাকে আদর্শের দিক থেকে "জঙ্গিদের" ব্যক্তি ও সামাজিক পরিচয়ের ক্ষুদ্র পরিসরে আটকে ফেলেছে। পাশাপাশি এ সুযোগে বাম্পার ফলন হচ্ছে আগাছার মতো গজিয়ে ওঠা নানা ধরনের মস্তিষ্কবিকৃত ষড়যন্ত্র তত্ত্ব ও তাত্ত্বিকদের।

অথচ প্রথম থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত বৈশ্বিক জিহাদের মূল উদ্দেশ্য হল আদর্শের প্রচার, ব্যক্তির প্রচার না। চূড়ান্ত বিচারে একজন উসামা, একজন আইমান, একজন আব্দুল্লাহ

আযযাম, একজন আনওয়ার আল-আওলাকীও আসলে গুরুত্বপূর্ণ না। গুরুত্বপূর্ণ হল তাদের আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছড়িয়ে দেওয়া, এবং উম্মাহকে এ আদর্শের অধীনে একত্রিত করা। কিন্তু গুলশান হামলার পর উল্টোটাই হচ্ছে। জঙ্গিদের ব্যক্তিপরিচয় প্রাধান্য পাচ্ছে, তাদের গল্প প্রাধান্য পাচ্ছে, কিন্তু আদর্শের জায়গাটা খালি থেকে যাচ্ছে। আদর্শের দিকে মনোযোগ যাচ্ছে না। আইএসের ক্ষেত্রে বারবার এটা হয়েছে। যেমন প্যারিসে হামলার পর, অরল্যান্ডো হামলার পর মনোযোগ গেছে হামলাকারীদের অতীতের উপর (যদিও তা একেবারেই অনুচিত)।

কিন্তু অন্যদিকে শার্লি এবদো কিংবা ৯/১১ এর হামলার পর আলোচনা গেছে এসব হামলার শার'ঈ বিশ্লেষণ, সামরিক পর্যালোচনা, এবং পশ্চিমা বিশ্বের সাথে ইসলামের মোকাবেলার ভাষা কি হওয়া উচিৎ সে আলোচনাতে। ব্যাপারটা কিন্তু এমন না যে পশ্চিমা মিডিয়া শার্লি এবদো কিংবা ৯/১১ এর হামলার পর হামলাকারীদের চরিত্রহরণ কিংবা মূল ফোকাস তাদের অতীতের দিকে সরানোর চেষ্টা করে নি। বরং এটা পশ্চিমা মিডিয়ার চিরাচরিত জঘন্য কৌশল যা তারা মুহাম্মাদ আতা থেকে শুরু করে কোয়াশী ভাই এবং উমার মতিন, সবার ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করেছে।

তফাৎটা হল ৯/১১ বা শার্লি এবদোর ক্ষেত্রে হামলার মাধ্যমে এমন সুস্পষ্ট মেসেজে দেওয়া হয়েছিল যাতে করে পশ্চিমা মিডিয়ার এ হীন কৌশল সফল হয় নি। এবং এটাই সতর্কতার সাথে ও অধিকতর বিবেচনার সাথে হামলার টার্গেট নির্ধারনের সফলতা।

এ বিচারে, জনগণের মাঝে প্রতিক্রিয়ার দিক থেকে গুলশান হামলা তেমন কোন ফলাফল দিতে পারছে না। হ্যা এতে করে হয়তো জামাতুল বাগদাদীর রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক ফল আসতে পারে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের ময়দানে এটি সফল-এমন বলা যাচ্ছে না।

অন্যদিকে এর সাথে তুলনা করুন আনসার আল ইসলাম বা আল-ক্বা'ইদা উপমহাদেশের বাংলাদেশের শাখার হামলাগুলোর প্রতিক্রিয়ার। সংখ্যায় এবং মাত্রা উভয় দিক দিয়ে জামাতুল বাগদাদীর হামলার তুলনায় কম হওয়া সত্ত্বেও আনসার আল ইসলামের হামলাসমূহকে জনসাধারণের মধ্যে মুজাহিদিনের প্রতি সমর্থন, সহমর্মিতা এবং জাতীয় পরিসরে ইসলাম বনাম কুফর – এ সমীকরণের ভিত্তিতে মেরুকরনের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে সফলতার স্বীকৃতি জনগণের দিক থেকে তো বটেই এসেছে দেশী-বিদেসশী মিডিয়া, তাগুত, এবং তাগুত বাহিনীর পক্ষ থেকেও।

নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত এক ইন্টারভিউতে কাউন্টার টেরোরিযম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশানাল ক্রাইমস ইউনিটের প্রধান মনিরুল নিজেই আনসার আল ইসলামের এ সফলতার সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছে।

“তারা সতর্কতার সাথে তাদের টার্গেট নির্ধারনের চেষ্টা করেছে যাতে করে জনসমর্থন আদায় করা যায়। এবং তারা এতে সফলও হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতাকে জনসাধারনের চোখে প্রশ্নবিদ্ধ করার ক্ষেত্রে তারা বিস্ময়কর সফলতা অর্জন করেছে।

সাধারণভাবে মানুষ এখন মনে করছে তারা যা করেছে ঠিকই করেছে, এবং ব্লগার, সমকামী এবং অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের হত্যা করা অযৌক্তিক কিছু না।

একই সাথে তারা বাংলাদেশের বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ সরকারকেও রক্ষনাত্মক অবস্থানে ঠেলে দিতে সক্ষম হয়েছে। যার ফলে একদিকে সরকার হত্যাকান্ডগুলোর নিন্দা জানিয়েছে, অন্যদিকে লেখক-ব্লগারদের আহবান জানিয়েছে ইসলামের সমালোচনা করে কিছু না লিখতে এবং তাদের এই বলে সতর্ক করেছে যে “অপ্রাকৃতিক যৌনকর্মের” পক্ষে প্রচারনা চালানো একটি ফৌজদারী অপরাধ।”

অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা মেজর জেনারেল আব্দুর রশীদের মতে,

“বাংলাদেশের রাজনীতি ধর্মনিরপেক্ষ বনাম ইসলামপন্থীতে পরিনত হয়েছে। যেকারণে সরকার হিসেব করে পা ফেলতে বাধ্য হচ্ছে।” [নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত “Bangladesh Says It Now Knows Who’s Killing the Bloggers” ,প্রকাশিত ৮ই জুন, ২০১৬। বিস্তারিত দেখুন – http://bit.ly/29mlHny]

আর সাধারণ মানুষের কাছে যদি এ অপারেশানগুলোর ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয় তবে এক বাক্যে তাদের সকলেই এগুলো সমর্থন করবে। জনগণের কাছে পরিষ্কার কেন জুলহায বা অভিজিৎদের হত্যা করা হচ্ছে, এবং তারা শুধু সম্পূর্ণ ভাবে একে সমর্থনই করে না, বরং অনেক ক্ষেত্রেই এ ধরনের অপারেশানের পক্ষে নিজে থেকে তর্কও করছে।

মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের ময়দানে কোন কৌশলটি কাজে লাগছে আর কোন কৌশল ব্যর্থ তা স্পষ্ট।

সামরিক পর্যালোচনাঃ

এবার দেখা যাক বিশ্বব্যাপী মুজাহিদিন যে চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধকৌশল [Fourth Generation Warfare/Asymmetric War of attrition] ব্যবহার করছেন সে দৃষ্টিকোন থেকে এ হামলার দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল কী কী?

মেরুকরণ, জনসম্পৃক্ততা, জনবিচ্ছিন্নতা – মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূখণ্ডগুলোতে জিহাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে সফলতার জন্য জনগোষ্ঠীর মাঝে মেরুকরণ অত্যন্ত জরুরী। আফগানিস্তান, সিরিয়া, সোমালিয়া, ওয়াযিরিস্তান, ইয়েমেন যেখানেই আল্লাহর ইচ্ছায় জিহাদী আন্দোলন সফলতা পেয়েছে, একটি শক্ত ভিত্তি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে, প্রতিটি ময়দান থেকেই এ সত্য বারবার প্রমাণিত হয়েছে।

ইসলাম ও কুফর, মুসলিম বনাম সেক্যুলার, আল্লাহর শাসন বনাম মানুষের শাসন এরকম বিভিন্ন মৌলিক প্রশ্নে এ সকল ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠীর মাঝে চরম মাত্রায় মেরুকরণ সফলতার

সাথে করা সম্ভব হয়েছে। যদিও এ মেরুকরণ একটি সামষ্টিক মানসিক প্রক্রিয়া, কিন্তু এ মানসিক প্রক্রিয়ার চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে মুজাহিদিনের বিভিন্ন সামরিক পদক্ষেপ। বিভিন্ন হামলা ও সামরিক-রাজনৈতিক পদক্ষেপের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে এসব ভূমির মুসলিমরা ক্রমান্বয়ে শাসক ও শাসন ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুজাহিদিনের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে।

বিশেষ করে বাংলাদেশে জিহাদ আন্দোলনের ক্ষেত্রে এ মেরুকরণের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। কারণ ভৌগলিক ভাবে গেরিলা যুদ্ধের জন্য মুক্তাঙ্গন বা সেইফ যোন (Safe Zone) হবার মতো কোন দুর্গম অঞ্চল বাংলাদেশে নেই যেমনটা অন্যান্য ময়দানে ছিল। একারণে জনগণের সাথে মিশে থেকেই মুজাহিদিনকে কাজ করতে হবে। ভৌগলিক সেইফ যোনের অনুপস্থিতিতে জনগণই মুজাহিদিনের ঢাল হিসেবে কাজ করবে। আর সঠিকভাবে মেরুকরনের উপরই নির্ভর করবে জিহাদ আন্দোলন কি জনবিচ্ছিন্ন হবে নাকি জনসম্পৃক্ততা অর্জন করবে। যদি সঠিক ভাবে মেরুকরণ ঘটে তবে ভৌগলিক সেইফ যোনের অনুপস্থিতিতেও মুজাহিদিন সহজেই চলাচল এবং কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে পারবেন। এক্ষেত্রে মুজাহিদিনকে যদি আমরা মাছ বিবেচনা করি তবে জনগণের ভূমিকা হবে পানির।

এ বিষয়টি কুফফার, তাগুত এবং তাগুত বাহিনীও জানে। একারণেই গুলশান হামলার পরপরই তারা জোর দিয়েছে সাধারণ মানুষকে নিজেদের তাবুতে আনার জন্য। র‍্যাব প্রধান বেনজীর থেকে শুরু করে সকলেই বারবার আহবান করেছে, “আপনার সন্তান নিখোঁজ হলে

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানান", "আপনার পরিচিতি কারো ব্যবহারে পরিবর্তন এলে জানান", "এলাকাতে নজর রাখুন, কর্মস্থলে নজর রাখুন" –ইত্যাদি। এধরণের আহবানের পেছনে যুক্তিটি খুব সহজ। তাগুত সরকার খুব ভালো ভাবেই বোঝে, যদি মুজাহিদিন জনগণের মাঝে মিশে থাকে তাহলে তাদের কাবু করার কোন সহজ উপায় তাদের কাছে নেই। যদি তারা শক্তি প্রয়োগ করে তবে জনগণ তাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে| কিন্তু জনগণকেই যদি "জঙ্গি"-দের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সরকারের কাজটি অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। একারণে তাগুত হাসিনা থেকে শুরু করে এলাকার আওয়ামী মাস্তান পর্যন্ত সবার মুখে একই কথা, জনগণকে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসতে হবে। তারা চাচ্ছে জনগণকে তাদের পক্ষে আনতে।

আর মুজাহিদিনের লক্ষ্য থাকে জনগণকে সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিতে, যেমনটা শাপলা চত্বরের ক্ষেত্রে হয়েছিল। মুজাহিদিনের লক্ষ্য থাকে সরকারের সাথে জনগণের দূরত্ব সৃষ্টি করার, সরকার ও জনগণের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস সৃষ্টি করার, তিক্ততা সৃষ্টি করার। সরকারকে ইসলামবিরোধী শক্তি এবং মুজাহিদিনকে ইসলামের পক্ষে একমাত্র শক্তি হিসেবে চিত্রিত করার। কিন্তু গুলশান হামলার পর ঠিক এর উল্টোটা হয়েছে। যেখানে সরকারকে জনবিচ্ছিন্ন করার দরকার ছিল সেখানে "জঙ্গিরা" ব্যাপকভাবে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

যেখানে জনগোষ্ঠীর মাঝে মেরুকরন করা দরকার ছিল ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে, সেখানে মেরুকরন হয়ে যাচ্ছে সাধারণ জনগণ আর জঙ্গিদের মধ্যে। অবশ্যই তাগুতী মিডিয়া এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, কিন্তু তাদের এরকম করাটাই স্বাভাবিক। মুজাহিদিনের দায়িত্ব হল এমন সুযোগ তাগুত ও তাগুতী মিডিয়াকে না দেওয়া।

যেমনটা অভিজিৎ কিংবা জুলহায কিংবা অন্যান্য ইসলামবিদ্বেষী ব্লগারের হত্যার ক্ষেত্রে হয়েছে, মিডিয়ার কোন কথাই জনগণ বিশ্বাস করে নি। এবং ব্যাপকভাবে জনগণ এ হামলা সমর্থন করেছে। অন্যদিকে এখন জনগণের মধ্যে ভয় কাজ করছে। যেখানে মুজাহিদিনের প্রতি শ্রদ্ধা মিশ্রিত সমীহ ও জিহাদের প্রতি সমর্থন তৈরি হওয়া দরকার, সেখানে তৈরি হচ্ছে তীব্র আতঙ্ক।

এমনকি সোশ্যাল মিডিয়াতে নিষ্ক্রিয় সমর্থন দেওয়া "জিহাদপন্থী" গোষ্ঠীর অনেকেও এ হামলার পর অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা ছাড়াই সমালোচনায় মেতে উঠেছেন। হাটু কাঁপাকাঁপি শুরু হয়ে গিয়েছে। এ যদি হয় জিহাদ নিয়ে লেখালেখি করা, নিজেদের "জিহাদি মানহাজের ভাই" – দাবি করাদের অবস্থা, যারা অন্তত তাত্বিকভাবে হলেও জিহাদ সমর্থন দেন, তাহলে সাধারণ মানুষের কি অবস্থা তা সহজেই অনুমেয়।

এ ভুখন্ডে দীর্ঘমেয়াদে কাজ করার ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত বিপদজনক একটি সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়ার সম্ভাবনা পুরোদমেই আছে।

লাভক্ষতির সমীকরণ –

ইতিমধ্যে আমরা আলোচনা করেছি এ অপারেশানে মূলত নিহত হয়েছে ইটালিয়ান ও জাপানিজ কুফফার। বৈশ্বিক জিহাদের প্রেক্ষাপটে যার তেমন কোন মূল্য নেই। পাশাপাশি চিন্তা করুন উপমহাদেশের পুর্বাঞ্চলে জিহাদী আন্দোলনের সার্বিক বিশ্লেষণে এ হামলায় যেসব টার্গেট হত্যা করা হয়েছে তাদের হত্যা করার জন্য ৫ জন প্রশিক্ষিত, এবং নিবেদিত প্রাণ ভাইকে কুরবানী করাতে লাভক্ষতির দিক দিয়ে এ অঞ্চলের জিহাদি আন্দোলনের দীর্ঘমেয়াদে কি লাভ হল, নাকি লোকসান হল?

আমি আবারো বলছি আমি এখানে এ হামলার শার''ঈ বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছি না। এ ৫ ভাইয়ের আত্বত্যাগ নিয়েও প্রশ্ন করছি না। জিহাদের জন্য তাদের ক্কুরবানী দেওয়ার যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন তুলছি না। জিহাদের জন্য ৫ জন কেন, ৫০,০০০ জন ভাইকে একের পর এক ক্কুর'বানী করতে আমাদের কোন দ্বিধা নেই।

কিন্তু আমাদের জন্য, "কখন, কোথায়, কেন" – এ প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়টি অনুধাবন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিছক শিরোনাম দখল করা, অস্তিত্ব জানান দেওয়া, সরকারকে বেকায়দায় ফেলা, মিডিয়াতে হাইপ সৃষ্টি করা, কিংবা জনা বিশেক স্ট্র্যাটিজিক ভাবে মূল্যহীন কাফির হত্যার জন্য ৫ জন মুজাহিদের ক্কুরবানীকে আমরা জিহাদী আন্দোলনের বিচারে লোকসান মনে করি। যদিও আল্লাহ চাইলে এ ৫জন ব্যক্তিগত ভাবে আল্লাহর সাথে ব্যবসায় লাভবান হয়েছেন।

দেখুন ইয়ারমুকের দিন, আল সাইফুল্লাহ মাসলুল খালিদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রায় সম্পূর্ণ সিরিয়া দখল করে ফেলেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি রোমানদের নতুন একটি বৃহদাকার বাহিনী আসতে দেখলেন, তিনি বিজিত অঞ্চল ছেড়ে দিয়ে মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার দক্ষিনে অবস্থান গ্রহন করেন। অথচ শার'ঈ দৃষ্টিকোন থেকে যে বিজিত অঞ্চল তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন তা দ্বার আল-ইসলামে পরিণত হয়েছিল। খালিদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর এ সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল, কারণ সামরিক কৌশলগত দিক থেকে এ পদক্ষেপ নেওয়ার দরকার ছিল।

পারস্যের মাজুসিদের বিরুদ্ধে আব্দুল্লাহ ইবন মারসাদ আস-সাকাফি যখন সেতুর দড়ি কেটে দিয়েছিলেন, তখন তার উদ্দেশ্য আপাতদৃষ্টিতে প্রশংসনীয় ছিল। তিনি চাচ্ছিলেন মুসলিম বাহিনী যেন কোন অবস্থাতেই পিছু না হটে এবং চিৎকার করে তিনি আহবান জানাচ্ছিলেন, “হে মুসলিমেরা, জীবন দাও যার জন্য জীবন দিয়েছেন তোমাদের নেতারা”।

কিন্তু তার এ সিদ্ধান্তের কারণে অনেক মুসলিম নদীতে ডুবে মৃত্যু বরণ করেন। মুসান্না ইবন হারিসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এ কাজে এতোই ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন, যে তিনি আব্দুল্লাহকে শারীরিক ভাবে আঘাত পর্যন্ত করেছিলেন। এবং আল মুসান্না রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নির্দেশ দিয়েছিলে সেতু মেরামত করার এবং তারপর মুসলিম বাহিনী পিছু হটেছিল। কারণ মুসলিমদের জীবন অত্যন্ত মূল্যবান। যেকোন কারণেই এ জীবনের ক্বুর'বানী দেওয়া যায় না।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একারণে কখনই এমন ব্যক্তিকে নেতৃত্ব দিতেন না যার মধ্যে ত্বরাপ্রবনতা ছিল। কারণ এমন ব্যক্তি যতোই সাহসী এবং শক্তিশালী হোক না কেন তার কারণে মুসলিমদের জীবন অপ্রয়োজনে হুমকির সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু আবু উবাইদা আস-সাকাফিকে বলেছিলেন – "সিদ্ধান্ত গ্রহনে তাড়াহুড়ো করে না। নেতৃত্ব শুধুমাত্র তাকেই মানায় যে স্থিতধী এবং যে জানে কোন সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হয়।" সাহসী হবার অর্থ বেপরোয়া হওয়া বা শুধুমাত্র ঝুঁকি নেওয়া না।

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ হামলার মাধ্যমে যা পাবার আছে (যা ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে) আর যা নেতিবাচক দিক আছে, সব কিছুর বিবেচনায় ১৬ জন জাপানি, ইটালিয়ান, দুই জন মুরতাদ পুলিশ, একজন ভারতীয় এবং একজন বাংলাদেশী-অ্যামেরিকান দ্বৈত নাগরিক হত্যার জন্য ৫ জন ভাইয়ের ক্বুরবানী সার্বিক বিবেচনাতে লাভজনক সওদা বলে প্রতীয়মান হয় না। বিশেষ করে এ হামলার মূল ফলাফল যখন হয় শিরোনাম দখল, অস্তিত্ব জানান দেওয়া এবং ব্র্যান্ডিং।

সর্বোপরি আমরা মনে করি জামাতুল বাগদাদীর বৈশ্বিক অপারেশানের কৌশলগত বিবেচনায় যে মূল দুর্বলতা ইতিপূর্বে দেখা গেছে তা এ হামলাতেও বিদ্যমান ছিল। আর তা হল উম্মাহর উত্তরণের এ প্রচেষ্টায় সহিংসতার ভূমিকা সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকা। সহিংসতা বা সন্ত্রাস – যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, এটি মূলত একটি উপকরন। সহিংসতা-

সন্ত্রাস একটি উপকরন যার ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা কিছু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জন করতে চাই। আমাদের সহিংসতা নিছক সহিংসতার খাতিরে সহিংসতা না।

বরং আমাদের সহিংসতা হল একটি নির্দিষ্ট সমীকরন মেলানোর জন্য প্রয়োজন একাধিক উপাদানের মধ্যে একটি উপাদান। সহিংসতা বা সন্ত্রাস নামক এ উপাদানকে যখন প্রয়োগ করা হবে তখন আমরা তা প্রয়োগ করবো প্রবল ও ব্যাপকভাবে। আমরা যখন আঘাত করবো তখন তা হবে ক্ষিপ্র ও প্রচন্ড। আমাদের সহিংসতা ও সন্ত্রাসের ব্যবহার শত্রুর মনে ব্যাপক ভীতির সঞ্চার করার জন্যই। একজন মানুষকে অনেক ভাবেই মারা যায়, কিন্তু চাপাতির আঘাতে মুখ-মাথা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার যে সুদূরপ্রসারী মানসিক প্রভাব শত্রুর উপর আছে সে বিবেচনাতে অপেক্ষাকৃত দ্রুততর, কম ঝামেলার “পরিচ্ছন্ন-পদ্ধতি” বন্দুক ব্যবহারের পরিবর্তে আমরা চাপাতিকেই প্রাধান্য দেবো। এক্ষেত্রে আমরা দুর্বল মানুষদের আবেগী বিবেচনা নিয়ে চিন্তিত হবো না। কিন্তু কখন, কোথায়, কেন, সহিংসতা ও সন্ত্রাসের প্রয়োগ করা হবে সেটি সূক্ষ বিবেচনার বিষয়।

কিন্তু জামাতুল বাগদাদী শুরু থেকেই সহিংসতার খাতিরে সন্ত্রাসকেই নিজেদের নীতি হিসেবে নিয়েছে, যা তাদের নিত্যনতুন অভিনব হত্যা পদ্ধতির অসুস্থ ভিডিও প্রকাশ করার ব্যাপারে আসক্তি থেকেই বোঝা যায়। পাশাপাশি তারা মানের তুলনায় সংখ্যা, পুনরাবৃত্তির হার, মিডিয়া শোরগোল, মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হওয়াকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে আসছে। একটি আগ্নেয়াস্ত্র একজন ১০ বছরের শিশু এবং একজন দশ বছরের যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন যোদ্ধা,

উভয়ের হাতেই বিপদজনক। কিন্তু দুজনের অস্ত্রের ব্যবহার আর তার ফলাফল এক হয় না। উভয়ের হাতেই এ অস্ত্রের ক্ষমতা থাকে রক্ত ঝরানোর। দুজনের হাতে একই অস্ত্র থাকলেও দুজনের অস্ত্রের ব্যহারের ফলাফল এক না। শিশুর এলোপাথারি গুলিবর্ষন স্বল্পমেয়াদে প্রচন্ড আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারলেও, দীর্ঘমেয়াদে সফলতা খুব কমই আনে। কিন্তু সঠিক নিশানায় সুদক্ষ নিশানাধারীর ছোড়া একটি গুলিও অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য অর্জনে যথেষ্ট হতে পারে।

উপসংহারঃ

সংকীর্ণ দলীয় অবস্থান থেকে ঘটনা প্রবাহের বিশ্লেষণ করা প্রথমত না-ইনসাফি, এবং দ্বিতীয়ত মৌলিক চিন্তাগত ভুল। এটা কখনোই আল-ক্বা'ইদার অবস্থান না, এবং নীতি না। এ জিহাদকে আমরা উম্মাহর জিহাদ মনে করি, আল-ক্বা'ইদার জিহাদ কিংবা কিছু বিশেষ এলিট শ্রেণীর মানুষের জিহাদ বলে মনে করি না। আমাদের নীতির সাথে যা মিলবে তার সবই ঠিক, আর যা মিলবে না তার সবই ভুল এমন অবস্থান আল-ক্বাইদা কখনোই গ্রহন করে নি। যদি কেউ মনে করে থাকেন দলগত আনুগত্যের ভিত্তিতে হামলার বিশ্লেষণ করা বা পর্যালোচনা করা আল-ক্বা'ইদার নীতি, যদি কেউ মনে করে আল-ক্বাইদা হামলা করলে সেটাকে সমর্থন করা আর অন্য কেউ হামলা করলে সেটার বিরোধিতা করা আল-ক্বা'ইদার নীতি, তবে সে আসলে আল-ক্বা'ইদাকে চিনতে সক্ষম হয় নি। হাকীমুল উম্মাহ শায়খ আইমান আল যাওয়ারিরির হাফিযাহুল্লাহ কথা পুনরাবৃত্তি করে আমরা সকলকেই মনে করিয়ে দিতে চাই –

“হে মুজাহিদিনগণ! মনে রাখুন মহান আল্লাহর সামনে কোন বাগদাদি, জাওলানি কিংবা যাওয়াহিরি আপনাদের হয়ে জবাব দেবে না।“

সামরিক কৌশলগত যে নীতি আমরা গ্রহন করেছি সেটি আমাদের ইজতিহাদ এবং আমাদের মতে তা সঠিক অবস্থানের সর্বাধিক নিকটবর্তী। কিন্তু তার অর্থ এই না যে, যারা আমাদের সাথে একমত হবে না, একমত না হওয়ার কারণেই তারা ভুল। বরং এটি এমন বিষয় যেখানে মতপার্থ্যকের অবকাশ আছে।

একই সাথে আমরা এটাও মনে করি জিহাদী অপারেশানগুলোর ক্ষেত্রে, বিশেষ করে মুসলিম অধ্যুষিত ভূখন্ডগুলোতে চালানো হামলাগুলোর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শার'ঈ বৈধতার বিষয়টি ছাড়াও অন্যান্য ফ্যাক্টরগুলো বিবেচনা করা সমান গুরুত্বপূর্ণ। যেমনটা শায়খ আতিয়াতুল্লাহ বলেছেন – “জিহাদ একটি ব্যবসা শুরু করার মতো।“ সবগুলো দিক বিবেচনার করার উপর এ ব্যবসার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। বিশ্বব্যাপী মুজাহিদিনের প্রায় ছয় দশকে অভিজ্ঞতা থেকেই এ একই শিক্ষা পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রেই একটি হামলা বৈধ হতে পারে, কিন্তু হয়তো ঐ হামলাটি ঐ মূহুর্তের জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত না। উম্মাহর দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব আমাদের পছন্দীয় না হতেই পারে। কিন্তু যেহেতু উম্মাহকে নিয়েই আমাদের আল্লাহর ইচ্ছায় এগিয়ে যেতে হবে তাই উম্মাহর বাস্তবতাকে স্বীকার করেই আমাদের হিসেব করতে হবে। অন্যথায় উম্মাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে যা সামরিক ও কৌশলগত উভয়দিক দিয়ে মুজাহিদিনকে দুর্বল অবস্থানে ঠেলে দেবে।

এ চিন্তাধারা ও উপরোল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে গুলশান হামলার ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান হল এই যে ভবিষ্যতে এ ধরনের হামলার ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত বিবেচনার দিকে জোর দেওয়া উচিৎ। যে দুর্বলতা গুলোর কথা এখানে আলোচিত হয়েছে সেগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখা উচিৎ। শুধুমাত্র সাময়িক লাভ বা মিডিয়ার মনোযোগ এ ভূমিতে শারীয়াহ কায়েম ও হিন্দ বিজয়ের যে দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচি সেক্ষেত্রে কোন ভূমিকা রাখবে না। এবং গুলশান হামলার ভালো দিকগুল সত্ত্বেও চূড়ান্ত ভাবে এ ধরনের সাময়িক লাভ ছাড়া কোন দীর্ঘমেয়াদী সুফল পাওয়া যাবে না বলেই আমরা মনে করি। ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি কিভাবে উপযুক্ত সক্ষমতা অর্জন ও সময়ের আগে কাজের দ্রুত প্রসারণের (Strategic Overreach) ফলে জেএমবি-র শত্রুর আঘাতে প্রতি নিজেকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। **মু'মিন এক গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না।** আর তাই এ দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা নেওয়া এ ভূমির মুজাহিদিনের জন্য আবশ্যক। ইনশা আল্লাহ এ ভূমিকে ঘিরে যে পরিকল্পনা তা সাময়িক শোরগোল কিংবা মিডীয়া হাইপ তৈরির পরিকল্পনা না, বরং বিশ্ব মানচিত্র পরিবর্তন করে দেওয়ার পরিকল্পনা, এবং আমরা আল্লাহর ইচ্ছাই সে লক্ষ্যেই কাজ করছি, এবং সফলতা শুধুমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই।

সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহর। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর ﷺ উপর, তার ﷺ পরিবারের উপর এবং তার ﷺ সাহাবীগণের উপর।

——-

জাস্টপেইস্ট.ইট লিঙ্ক – https://justpaste.it/gulshan_review